তিনদিনের স্মৃতিলিপি

(সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিত)

২২ জানুআরি, ১৮৯৮ খ্রীঃ; ১০ মাঘ শনিবার। সকালে উঠিয়াই হাতমুখ ধুইয়া বাগবাজার ৫৭নং রামাকান্ত বসু স্ট্রীটস্থ বলরামবাবুর বাটিতে স্বামীজীর কাছে উপস্থিত হইয়াছি। একঘর লোক। স্বামীজী বলিতেছেন: চাই শ্রদ্ধা, নিজেদের ওপর বিশ্বাস চাই। Strength is life, weakness is death (সবলতাই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু)। আমরা আত্মা, অমর, মুক্ত -- pure, pure by nature (পবিত্র, স্বভাবতঃ পবিত্র)। আমরা কি কখনও পাপ করতে পারি? অসম্ভব। এই রকম বিশ্বাস চাই। এই বিশ্বাসই আমাদের মানুষ করে, দেবতা করে তোলে। এই শ্রদ্ধার ভাবটা হারিয়েই তো দেশটা উৎসন্ন গিয়েছে।

প্রশ্ন -- এই শ্রদ্ধাটা আমাদের কেমন করে নষ্ট হল?

স্বামীজী -- ছেলেবেলা থেকে আমরা negative education (নেতিমূলক শিক্ষা) পেয়ে আসছি। আমরা কিছু নই -- এ শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। আমাদের দেশে যে বড়লোক কখন জন্মেছে, তা আমরা জানতেই পাই না। Positive (ইতিমূলক) কিছু শেখান হয়নি। হাত-পায়ের ব্যবহার তো জানিইনি। ইংরেজদের সাতগুষ্টির খবর জানি, নিজের বাপ-দাদার খবর রাখি না। শিখেছি কেবল দুর্বলতা। জেনেছি যে আমরা বিজিত দুর্বল, আমাদের কোন বিষয় স্বাধিনতা নেই। এতে আর শ্রদ্ধা নষ্ট হবে না কেন? দেশে এই শ্রদ্ধার ভাবটা আবার আনতে হবে। নিজেদের উপর বিশ্বাসটা আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। তাহলেই দেশের যত কিছু problems (সমস্যাগুলি) ক্রমশঃ আপনা-আপনিই solved (মীমাংসিত) হয়ে যাবে।

প্রশ্ন -- সব দোষ শুধরে যাবে, তাই কি কখনও হয়? সমাজে কত অসংখ্য দোষ রয়েছে! দেশে কত অভাব রয়েছে, যা পূরণ করবার জন্য কংগ্রেস প্রভৃতি অন্যান্য দেশহিতৈষী দল কত আন্দোলন করছে, ইংরেজ বাহাদুরের কাছে কত প্রার্থনা করছে। এ-সব অভাব কিসে পূরণ হবে?

স্বামীজী -- অভাবটা কার? রাজা পূরণ করবে, না তোমরা পূরণ করবে?

প্রশ্ন -- রাজাই অভাব পূরণ করবেন। রাজা না দিলে আমরা কোথা থেকে কি পাব, কেমন করে পাব?

স্বামীজী -- ভিখিরির অভাব কখনও পূর্ণ হয় না। রাজা অভাব পূরণ করলে সব রাখতে পারবে, সে লোক কই? আগে মানুষ তৈরি কর। মানুষ চাই। আর শ্রদ্ধা না আসলে মানুষ কি করে হবে?

প্রশ্ন -- মহাশয়, majority-র (অধিকাংশের) কিন্তু এ মত নয়।

স্বামীজী -- Majority (অধিকাংশ) তো fools (নির্বোধ), men of common intellect (সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন); মাথাওয়ালা লোক অল্প। এই মাথাওয়ালা লোকেরাই সব কাজের সব department-এরই (বিভাগেরই) নেতা। এদেরই ইঙ্গিতে majority (অধিকাংশ) চলে। এদেরই আদর্শ করে চললে কাজও সব ঠিক হয়। আহাম্মকেরাই শুধু হামবড়া হয়ে চলে, আর মরে। সমাজ-সংস্কার আর কি করবে? তোমাদের সমাজ-সংস্কার মানে তো বিধবার বিয়ে আর স্ত্রী-স্বাধীনতা বা ঐ রকম আর কিছু। তোমাদের দুই-এক বর্ণের সংস্কারের কথা বলছ তো? দুই-চার জনের সংস্কার হল, তাতে সমস্ত জাতটার কি এসে যায়? এটা সংস্কার না

স্বার্থপরতা? নিজেদের ঘরটা পরিস্কার হল, আর যারা মরে মরুক।

প্রশ্ন -- তাহলে কি কোন সমাজ-সংস্কারের দরকার নেই বলেন?

স্বামীজী -- দরকার আছে বৈকি। আমি তা বলছি না। তোমাদের মুখে যা সংস্কারের কথা শুনতে পাই, তার মধ্যে অনেকগুলোই অধিকাংশ গরিব সাধারণদের স্পর্শই করবে না। তোমরা যা চাও, তা তাদের আছে। এজন্য তারা ওগুলোকে সংস্কার বলেই মনে করবে না। আমার কথা এই যে, শ্রদ্ধার অভাবই আমাদের মধ্যে সমস্ত evils (অনর্থ) এনেছে ও আরও আনছে। আমার চিকিৎসা হচ্ছে রোগের কারণকে নির্মুল করা -- রোগ চাপা দিয়ে রাখা নয়। সংস্কার আর দরকার নেই? যেমন ভারতবর্ষে inter-marriage (অন্তর্বিবাহ)-টা হওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্বলতা এসেছে।

***

২৩ জানুআরি, ১৮৯৮; ১১ মাঘ, রবিবার। বাগবাজারে বলরামবাবুর বাটীতে সন্ধ্যার পর আজ সভা হইয়াছে। স্বামীজী উপস্থিত আছেন। স্বামী তুরিয়ানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছেন। স্বামীজী পূর্বদিকের বারান্দায় বসিয়া আছেন। বারান্দাটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তর দিকের বারান্দাও সেইরূপ লোকে পরিপূর্ণ। স্বামীজী কলিকাতায় থাকিলে নিত্যই এইরূপ হইত। স্বামীজী সুন্দর গান গাহিতে পারেন, অনেকে শুনিয়াছেন। অধিকাংশ লোকের গান শুনিবার ইচ্ছা দেখিয়া মাস্টার মহাশয় ফিস্ ফিস্ করিয়া দু-এক জনকে স্বামীজীর গান শুনিবার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন। স্বামীজী নিকটেই ছিলেন, মাস্টার মহাশয়ের কান্ড দেখিতে পাইলেন।

স্বামীজী -- কি বলছ মাস্টার বল না? ফিস ফিস করছ কেন?

মাস্টার মহাশয়ের অনুরোধক্রমে অতঃপর স্বামীজী ‘যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে’ গানটি ধরিলেন। যেন বীণার ঝঙ্কার উঠিতে লাগিল। যাঁহারা তখন আসিতেছিলেন, তাঁহারা সিঁড়ি হইতে মনে করিলেন -- যেন গানটি বেহালার সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গীত হইতেছে। গান শেষ হইলে স্বামীজী মাস্টার মশায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ‘হয়েছে তো? আর গান না। নেশা ধরে যাবে। আর গলাটা লেকচার দিয়ে দিয়ে মোটা হয়ে গেছে। Voice (গলার স্বর)-টা roll করে (কাঁপে)।’

অতঃপর স্বামীজী এক ব্রহ্মচারী শিষ্যকে ‘মুক্তির স্বরূপ’ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। ব্রহ্মচারীটি সভাস্থলে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতান্তে শচীনবাবু ও আর দু-এক জন বক্তৃতার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলিলেন। স্বামীজী তাঁহার একজন গৃহীভক্তকে বলিলেন, ‘এর পক্ষে বা বিপক্ষে যদি কিছু বলবার থাকে তো বল।’ স্বামীজী উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে দু-এক জনকে ‘মুক্তির স্বরূপ’ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। দ্বৈত অদ্বৈতের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক তর্ক হইল। তর্ক ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া স্বামীজী ও তুরীয়ানন্দ স্বামী উভয়ে তর্ক-বিতর্ক থামাইয়া দিলেন।

স্বামীজী -- রেগে উঠলি কেন? তোরা বড় গোল করিস। তিনি (পরমহংসদেব) বলতেন, ‘শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তি এক।’ ভক্তিমতে ভগবানকে প্রেমময় বলা হয়। তাঁকে ভালবাসি -- এ-কথাও বলা যায় না, তিনি যে ভালবাসাময়। যে ভালবাসাটা হৃদয়ে আছে, তাই যে তিনি। এইরূপ যার যে-টান, সে সমস্তই তিনি। চোর চুরি করে,

বেশ্যা বেশ্যাগিরি করে, মা ছেলেকে ভালবাসে -- সব জায়গাতেই তিনি। একটা জগৎ আর একটাকে টানছে, সেখানেও তিনি। সর্বত্রই তিনি। জ্ঞানপক্ষেও সর্বস্থানে তাঁকে অনুভব হয়। এইখানেই জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য। যখন ভাবে ডুবে যায় অথবা সমাধি হয়, তখনই দ্বিভাব থাকতে পারে না -- ভক্তের সহিত ভগবানের পৃথকত্ব থাকে না। ভক্তিশাস্ত্রে ভগবানলাভের জন্য পাঁচ ভাবে সাধনের কথা আছে, আর এক ভাবের সাধন তাতে যোগ করা যেতে পারে - ভগবানকে অভেদভাবে সাধন করা। ভক্তেরা অদ্বৈতবাদীদের 'অভেদবাদী ভক্ত' বলতে পারেন। মায়ার ভেতর যতক্ষণ, ততক্ষণ দ্বৈত থাকবেই। দেশ-কাল-নিমিত্ত বা নাম-রূপই মায়া। যখন এই মায়ার পারে যাওয়া যায়, তখনই একত্ববোধ হয়; তখন মানুষ দ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী থাকে না, তার কাছে তখন সব এক, এই বোধ হয়। জ্ঞানী ও ভক্তের তফাত কোথায় জানিস? একজন ভগবানকে বাইরে দেখে, আর একজন ভগবানকে ভেতরে দেখে। তবে ঠাকুর বলতেন, ভক্তির আর এক অবস্থাভেদ আছে, যাকে পরাভক্তি বলা যায়; মুক্তিলাভ করে অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থিত হয়ে তাঁকে ভক্তি করা। যদি বলা যায় -- মুক্তিই যদি হয়ে গেল, তবে আবার ভক্তি করবে কেন? এর উত্তর এই -- মুক্ত যে, তার পক্ষে কোন নিয়ম বা প্রশ্ন হতে পারে না। মুক্ত হয়েও কেউ কেউ ইচ্ছে করে ভক্তি রেখে দেয়।

প্রশ্ন -- মশায়, এ তো বড় মুশকিলের কথা। চোরে চুরি করবে, বেশ্যা বেশ্যাগিরি করবে, সেখানেও ভগবান; তাহলে ভগবানই তো সব পাপের জন্য দায়ী হলেন।

স্বামীজী -- ঐ রকম জ্ঞান একটা অবস্থার কথা। ভালবাসা-মাত্রকেই যখন ভগবান বলে বোধ হবে, তখনই কেবল ঐ রকম মনে হতে পারে। সেই রকম হওয়া চাই। ভাবটার realisation (উপলব্ধি) হওয়া দরকার।

প্রশ্ন -- তাহলে তো বলতে হবে, পাপেতেও তিনি।

স্বামীজী -- পাপ আর পুণ্য বলে আলাদা জিনিস তো কিছু নেই। ওগুলো ব্যবহারিক কথামাত্র। আমরা কোন জিনিসের এক-রকম ব্যবহারের নাম 'পাপ' ও আর এক-রকম ব্যবহারের নাম 'পুণ্য' দিয়ে থাকি। যেমন এই আলোটা জ্বলার দরুন আমরা দেখতে পাচ্ছি ও কত কাজ করছি, আলোর এই এক-রকম ব্যবহার। আবার এই আলোতে হাত দাও, হাত পুড়ে যাবে। এটা আলোর আর এক-রকম ব্যবহার। অতএব ব্যবহারেই জিনিসটা ভাল-মন্দ হয়ে থাকে। পাপ-পুণ্যটাও ঐ রকম। আমাদের শরীর ও মনের কোন শক্তিটার সুব্যবহারের নামই 'পুণ্য' এবং কুব্যবহার বা অপচয়ের নাম 'পাপ'।

প্রশ্নের উপর প্রশ্ন হইতে লাগিল। একজন বলিলেন, 'একটা জগৎ আর একটাকে টানে সেখানেও ভগবান -- এক-কথা সত্য হোক আর না হোক, এর মধ্যে বেশ poetry (কবিত্ব) আছে।'

স্বামীজী -- না হে বাপু, ওটা poetry (কবিত্ব) নয়। ওটা জ্ঞান হলে দেখতে পাওয়া যায়।

আবার Mill (মিল), Hamilton (হ্যামিল্টন), Herbert Spencer (হার্বার্ট স্পেনসার) প্রভৃতির দর্শন হইতে লাগিল। স্বামীজী সকলেরই যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। উত্তরে সকলেই মহা সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহার উত্তরদানে তৎপরতা ও পান্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শেষে আবার প্রশ্ন হইল।

প্রশ্ন -- ব্যবহারিক প্রভেদই বা কেন? কোন শক্তি মন্দরূপে ব্যবহার করতে লোকের প্রবৃত্তিই বা হয় কেন?

স্বামীজী -- নিজের নিজের কর্ম অনুসারে প্রবৃত্তি হয়, সবই নিজের কর্মকৃত; সেইজন্যই প্রবৃত্তি দমন বা তাকে

সুচনারুরূপে চালনা করাও সম্পূর্ণ নিজের হাতে।

প্রশ্ন -- সবই কর্মের ফল হলেও গোড়া তো একটা আছে। সেই গোড়াতেই বা আমাদের প্রবৃত্তির ভাল মন্দ হয় কেন?

স্বামীজী -- কে বললে গোড়া আছে? সৃষ্টি যে অনাদি। বেদের এই মত। ভগবান যতদিন আছেন, তাঁর সৃষ্টিও ততদিন আছে।

প্রশ্ন -- আচ্ছা মায়াটা কেন এল? আর কোথা থেকে এল?

স্বামীজী -- ভগবান সম্বন্ধে 'কেন' বলাটা ভুল। 'কেন' বলা যায় কার সম্বন্ধে? -- যার অভাব আছে, তারই সম্বন্ধে। যার কোন অভাব নেই, যে পূর্ণ, তার পক্ষে আবার কেন কি? 'মায়া কোথা থেকে এল?' -- এরূপ প্রশ্নও হতে পারে না। দেশ-কাল-নিমিত্তের নামই মায়া। তুমি আমি সকলেই এই মায়ার ভেতর। তুমি প্রশ্ন করছ ঐ মায়ার পারের জিনিস সম্বন্ধে। মায়ার ভেতর থেকে মায়ার পারের জিনিসের কি কোন প্রশ্ন হতে পারে?

অতঃপর অন্য দুই-চারিটা কথার পর সভা ভঙ্গ হইল। আমরাও সকলে আপন আপন বাসায় ফিরিলাম।

***

২৪ জানুআরি, ১৮৯৮; ১২ মাঘ, সোমবার। গত শনিবার যে-লোকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনি আবার আসিয়াছেন। তিনি intermarriage (অন্তর্বিবাহ) সম্বন্ধে আবার কথা পাড়িলেন। বলিলেন, 'ভিন্ন জাতির সহিত আমাদের কিরূপে আদান-প্রদান হতে পারে?'

স্বামীজী -- বিধর্মী জাতিদের ভেতর আদান-প্রদান হবার কথা আমি বলি না। অন্ততঃ আপাততঃ তা সমাজ-বন্ধনকে শিথিল করে নানা উপদ্রবের কারণ হবে, এ কথা নিশ্চিত। জানো তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন -- 'ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নং' ইত্যাদি[১]; সমধর্মীদের মধ্যেই বিবাহ প্রচলনের কথা আমি বলে থাকি।

প্রশ্ন -- তা হলেও তো অনেক গোল। মনে করুন, আমার এক মেয়ে আছে, সে এদেশে জন্মেছে ও পালিত হয়েছে। তার বিয়ে দিলুম এক পশ্চিমে লোকের সঙ্গে বা মাদ্রাজীর সঙ্গে। বিয়ের পর মেয়ে জামাইয়ের কথা বোঝে না, জামাইও মেয়ের কথা বোঝে না। আবার পরস্পরের দৈনিক ব্যবহারাদিরও অনেক তফাত। বর-কনে সম্বন্ধে তো এই গন্ডগোল; আবার সমাজেও মহা বিশৃঙ্খলা এসে পড়বে।

স্বামীজী -- ও-রকম বিয়ে হতে আমাদের দেশে এখনও ঢের দেরি। একেবারে ও-রকম করাও ঠিক নয়। কাজের একটা secret (রহস্য) হচ্ছে -- to go by the way of least possible resistance (যতদূর সম্ভব কম বাধার পথে চলা)। সেইজন্য প্রথমে এক বর্ণের মধ্যে বিয়ে চলুক। এই বাঙলা দেশের কায়স্থদের কথা ধর। এখানে কায়স্থদের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে -- উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ ইত্যাদি। এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নেই। প্রথমে উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ীতে বিবাহ হোক। যদি তা সম্ভব না হয়, বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীতে বিবাহ হোক। এইরূপে -- যেটা আছে, সেটাকেই গড়তে হবে, ভাঙার নাম সংস্কার নয়।

---

[১] গীতা, ১।৩৯

প্রশ্ন -- আচ্ছা না হয় বিয়েই হল, তাতে ফল কি? উপকার কি?

স্বামীজী -- দেখতে পাচ্ছ না, আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধ্যে একশ বছর ধরে বিয়ে হয়ে হয়ে এখন ধরতে গেলে সব ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে হতে আরম্ভ হয়েছে। তাতেই শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে যত রোগও এসে জুটেছে। অতি অল্পসংখ্যক লোকের ভেতর চলাফেরা করেই রক্তটা দূষিত হয়ে পড়েছে। তাদের শরীরগত রোগাদি নবজাত সকল শিশুই নিয়ে জন্মাচ্ছে। সেইজন্য তাদের শরীরের রক্ত জন্মাবধি খারাপ। কাজেই কোন রোগের বীজকে resist করবার (বাধা দেবার) ক্ষমতা ও-সব শরীরে বড় কম হয়ে পড়েছে। শরীরের মধ্যে একবার নূতন অন্যরকম রক্ত বিবাহের দ্বারা এসে পড়লে এখনকার রোগাদির হাত থেকে ছেলেগুলো পরিত্রান পাবে এবং এখনকার চাইতে ঢের active (কর্মঠ) হবে।

প্রশ্ন -- আচ্ছা মশাই, early marriage (বাল্যবিবাহ) সম্বন্ধে আপনার মত কি?

স্বামীজী -- বাঙলাদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে ছেলেদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার নিয়মটা উঠে গিয়েছে। মেয়েদের মধ্যেও পূর্বের চেয়ে দু-এক বছর বড় করে বিয়ে দেওয়া আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সেটা হয়েছে টাকার দায়ে। তা যেজন্যই হোক, মেয়েগুলোর আরও বড় করে বিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু বাপ-বেচারীরা কি করবে? মেয়ে বড় হলেই বাড়ির গিন্নি থেকে আরম্ভ করে যত আত্মীয়রা ও পাড়ার মেয়েরা বে দেবার জন্য নাকে কান্না ধরবে, আর তোমাদের ধর্মধ্বজীদের কথা বলে আর কি হবে! তাদের কথা তো আর কেউ মানে না, তবুও তারা নিজেরাই মোড়ল সাজে। রাজা বললে যে, বার বছরের মেয়ের সহবাস করতে পারবে না, অমনি দেশের সব ধর্মধ্বজীরা 'ধর্ম গেল, ধর্ম গেল' বলে চিৎকার আরম্ভ করলে। বার-তের বছরের বালিকার গর্ভ না হলে তাদের ধর্ম হবে না! রাজাও মনে করেন, বা রে এদের ধর্ম! এরাই আবার political agitation (রানজনীতিক আন্দোলন) করে, political right (রাষ্ট্রীয় অধিকার) চায়।

প্রশ্ন -- তা হলে আপনার মত -- মেয়ে-পুরুষ সকলেরই বেশি বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত।

স্বামীজী -- কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই। তা না হলে অনাচার ব্যভিচার আরম্ভ হবে। তাবে যে-রকম শিক্ষা চলেছে, সে-রকম নয়। Positive (ইতিমূলক) কিছু শেখা চাই। খালি বই-পড়া শিক্ষা হলে হবে না। যাতে character form (চরিত্র তৈরি) হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই।

প্রশ্ন -- মেয়েদের মধ্যে অনেক সংস্কার দরকার।

স্বামীজী -- ঐ-রকম শিক্ষা পেলে মেয়েদের problems (সমস্যাগুলো) মেয়েরা নিজেরাই solve (মীমাংসা) করবে। আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করে আসছে। একটা কিছু হলে কেবল কাদতেই মগবুত। বীরত্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ সময়ে তাদের মধ্যে self-defence (আত্মরক্ষা) শেখা দরকার হয়ে পড়েছে। দেখ দেখি ঝাঁসির রানী কেমন ছিল!

প্রশ্ন -- আপনি যা বলেছেন, তা বড়ই নূতন ধরনের; আমাদের মেয়েদের মধ্যে সে-শিক্ষা দিতে এখনও সময় লাগবে।

স্বামীজী -- চেষ্টা করতে হবে। তাদের শেখাতে হবে। নিজেদেরও শিখতে হবে। খালি বাপ হলেই তো হয় না, অনেক দায়িত্ব ঘাড়ে করতে হয়। আমাদের মেয়েদের একটা শিক্ষা তো সহজেই দেওয়া যেতে পারে। হিন্দুর মেয়ে -- সতীত্ব কি জিনিস, তা সহজেই বুঝতে পারবে; এটা তাদের heritage (উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জিনিস) কিনা। প্রথমে সেই ভাবটাই বেশ করে তাদের মধ্যে উস্কে দিয়ে তাদের character form (চরিত্র তৈরি) করতে হবে -- যাতে তাদের বিবাহ হোক বা তারা কুমারী থাকুক, সকল অবস্থাতেই সতীত্বের জন্য প্রাণ দিতে কাতর না হয়। কোন একটা ভাবের জন্য প্রাণ দিতে পারাটা কি কম বীরত্ব? এখন যে রকম সময় পড়েছে, তাতে তাদের ঐ যে ভাবটা বহুকাল থেকে আছে, তার বলেই তাদের মধ্যে কতকগিলিকে চিরকুমারী করে রেখে ত্যাগধর্ম শিক্ষা দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানাদি অন্য সব শিক্ষা, যাতে তাদের নিজের ও অপরের কল্যাণ হতে পারে, তাও শেখাতে হবে, তা হলে তারা অতি সহজেই ঐ-সব শিখতে পারবে এবং ঐরূপ শিখতে অনন্দও পাবে। আমাদের দেশে যথার্থ কল্যাণের জন্য এই-রকম কতকগুলি পবিত্রজীবন ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী দরকার হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন -- এইরূপ ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী হলেও দেশের কল্যাণ কেমন করে হবে?

স্বামীজী -- তাদের দেখে ও তাদের চেষ্টায় দেশটার আদর্শ উলটে যাবে। এখন -- ধরে বিয়ে দিতে পারলেই হল! তা ন-বছরেই হোক, দশ-বছরেই হোক! এখন এ-রকম হয়ে পড়েছে যে, তের বছরের মেয়ের সন্তান হলে গুষ্টিসুদ্ধুর আহ্লাদ কত, তার ধুমধামই বা দেখে কে! এ ভাবটা উলটে গেলে ক্রমশঃ দেশে শ্রদ্ধাও আসতে পারবে। যারা ঐ-রকম ব্রহ্মচর্য করবে, তাদের তো কথাই নেই -- কতটা শ্রদ্ধা, নিজেদের উপর কতটা বিশ্বাস তাদের হবে, তা বলা যায় না।

শ্রোতা মহাশয় এতক্ষণ পরে স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উঠিতে উদ্যত হইলেন। স্বামীজী বলিলেন, 'মাঝে মাঝে এস।' তিনি বলিলেন, 'ঢের উপকার পেলুম; অনেক নূতন কথা শুনলুম, এমন আর কখনও কোথাও শুনিনি।' সকাল হইতে কথাবার্তা চলিতেছিল, এখন বেলা হইয়াছে দেখিয়া আমিও স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

স্নান আহার ও একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বাগবাজারে চলিলাম। আসিয়া দেখি স্বামীজীর কাছে অনেক লোক। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা হইতেছে। হাসি-তামাসাও চলিতেছে। একজন বলিয়া উঠিলেন, 'মহাপ্রভুর কথা নিয়ে এত রঙ্গরসের কারণ কি? আপনারা কি মনে করেন, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন না, তিনি জীবের মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করেন নাই?'

স্বামীজী -- কে বাবা তুমি? কাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে হবে? তোমাকে নিয়ে নাকি? মহাপ্রভুকে নিয়ে রঙ্গ-তামাসা করাটাই দেখছ বুঝি? তাঁর কাম-কাঞ্চন ত্যাগের জ্বলন্ত আদর্শ নিয়ে এতদিন যে জীবনটা গড়বার ও লোকের ভেতর সেই ভাবটা ঢোকাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেটা দেখতে পাচ্ছ না? শ্রীচৈতন্যদেব মহাত্যাগী পুরুষ ছিলেন; স্ত্রীলোকের সংস্পর্শেও থাকতেন না। কিন্তু পরে চেলারা তাঁর নাম করে নেড়া-নেড়ির দল করলে। আর তিনি যে প্রেমের ভাব নিজের জীবনে দেখালেন, তা স্বার্থশূন্য কামগন্ধহীন প্রেম। তা কখনও সাধারণের সম্পত্তি হতে পারে না। অথচ তাঁর পরবর্তী বৈষ্ণব গুরুরা আগে তাঁর ত্যাগটা শেখানোর দিকে ঝোঁক না দিয়ে তাঁর প্রেমটাকে সাধারণের ভেতর ঢকাবার চেষ্টা করলেন। কাজেই সাধারণ লোকে সেই উচ্চ প্রেমভাবটা নিতে পারলে না এবং সেটাকে নায়ক-নায়িকার দূষিত প্রেম করে তুললে।

প্রশ্ন -- মহাশয়, তিনি তো আচন্ডালে হরিনাম প্রচার করলেন, তা সেটা সাধারণের সম্পত্তি হবে না কেন?

স্বামীজী -- প্রচারের কথা হচ্ছে না, তাঁর ভাবের কথা হচ্ছে -- প্রেম, প্রেম -- রাধা-প্রেম। যা নিয়ে তিনি দিনরাত মেতে থাকতেন, তার কথা হচ্ছে।

প্রশ্ন -- সেটা সাদারণের সম্পত্তি হবে না কেন?

স্বামীজী -- সাধারণের সম্পত্তি কি করে হয়, তা এই জাতটা দেখে বোঝে না? ঐ প্রেম প্রচার করেই তো সমস্ত জাতটা 'মেয়ে' হয়ে গিয়েছে। সমস্ত উড়িষ্যাটা কাপুরুষ ও ভীরুর আবাস হয়ে গুয়েছে। আর এই বাঙলা দেশটায় চার-শ বছর ধরে রাধা-প্রেম করে কি দাঁড়িয়েছে দেখ! এখানেও পুরুষত্বের ভাব প্রায় লোপ পেয়েছে। লোকগুলো কেবল কাঁদতেই মজবুত হয়েছে। ভাষাতেই ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় -- তা চার-শ বছর ধরে বাঙলা ভাষায় যা কিছু লেখা হয়েছে, সে-সব এক কান্নার সুর। প্যানপ্যানানি ছাড়া আর কিছুই নেই। একটা বীরত্বসূচক কবিতারও জন্ম দিতে পারেনি!

প্রশ্ন -- এই প্রেমের অধিকারী তবে কারা হতে পারে?

স্বামীজী -- কাম থাকতে প্রেম হয় না -- এক বিন্দু থাকতেও হয় না। মহাত্যাগী, মহাবীর পুরুষ ভিন্ন ও-প্রেমের অধিকারী কেউ নয়। ওই প্রেম সাধারণের সম্পত্তি করতে গেলে নিজেদের এখনকার ভেতরকার ভাবটাই ঠেলে উঠবে। ভগবানের উপর প্রেমের কথা মনে না পড়ে ঘরের গিন্নিদের সঙ্গে যে প্রেম, তার কথাই মনে উঠবে। আর প্রেমের যা অবস্থা হবে, তা তো দেখতেই পাচ্ছ!

প্রশ্ন -- তবে কি ঐ প্রেমের পথ দিয়ে ভজন করে -- ভগবানকে স্বামী ও নিজেকে স্ত্রী ভেবে ভজন করে -- তাঁকে (ভগবানকে) লাভ করা গৃহস্থের পক্ষে অসম্ভব?

স্বামীজী -- দু-এক জনের পক্ষে সম্ভব হলেও সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে যে অসম্ভব, এ-কথা নিশ্চিত। আর এ-কথা জিজ্ঞাসারই বা এত আবশ্যক কি? মধুর-ভাব ছাড়া ভগবানকে ভজন করাবার আর কি কোন পথ নেই? আরও চারটে ভাব আছে তো, সেগুলো ধরে ভজন কর না? প্রাণভরে তাঁর নাম কর না? হৃদয় খুলে যাবে। তারপর যা হবার আপনি হবে। তবে এ-কথা নিশ্চিত জেনো যে, কাম থাকতে প্রেম হয় না। কামশূন্য হবার চেষ্টাটাই আগে কর না। বলবে, তা কি করে হবে? -- আমি গৃহস্থ। গৃহস্থ হলেই কি কামের একটা জালা হতে হবে? স্ত্রী সঙ্গে কামজ সম্বন্ধ রাখতেই হবে? আর মধুরভাবের ওপরই বা এত ঝোঁক কেন? পুরুষ হয়ে মেয়ের ভাব নেবার দরকার কি?

প্রশ্ন -- হাঁ, নামকীর্তনটাও বেশ। সেটা লাগেও বেশ, শাস্ত্রেও কীর্তনের কথা আছে। চৈতন্যদেবও তাই প্রচার করলেন। যখন খোলটা বেজে ওঠে, তখন প্রাণটা যেন মেতে ওঠে আর নাচতে ইচ্ছে করে।

স্বামীজী -- বেশ কথা, কিন্তু কীর্তন মানে কেবল নাচাই মনে কর না। কীর্তন মানে ভগবানের গুনগান, তা যেমন করেই হোক। বৈষ্ণবদের মাতামাতি ও নাচ ভাল বটে, কিন্তু তাতে একটা দোষও আছে। সেটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে যেও। কি দোষ জান? প্রথমে একেবারে ভাবটা খুব জমে, চোখ দিয়ে জল বেরোয়, মাথাটাও রি-রি করে, তারপর যেই সঙ্কীর্তন থামে তখন সে ভাবটা হু হু করে নাবতে থাকে। ঢেউ যত উঁচুতে ওটে, নামবার সময় সেটা তত নিচুতে নাবে। বিচারবুদ্ধি সঙ্গে না থাকলেই সর্বনাশ, সে-সময়ে রক্ষা পাওয়া ভার। কামাদি নীচ ভাবের অধীন

হয়ে পড়তে হয়। আমেরিকাতেও ঐরূপ দেখেছি কতকগুলো লোক গির্জায় গিয়ে বেশ প্রার্থনা করলে, ভাবের সঙ্গে গাইলে, লেকচার শুনে কেঁদে ফেললে -- তারপর গির্জা থেকে বেরিয়েই বেশ্যালয় ঢুকল।

প্রশ্ন -- তা হলে মহাশয়, চৈতন্যদেবের দ্বারা প্রবর্তিত ভাবগুলির ভেতর কোন্ গুলি নিলে আমাদের কোনরূপ ভ্রমে পড়তে হবে না এবং মঙ্গলও হবে?

স্বামীজী -- জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সঙ্গে ভগবানকে ডাকবে। ভক্তির সঙ্গে বিচারবুদ্ধি রাখবে। এ ছাড়া চৈতন্যদেবের কাছ থেকে আরও নেবে তাঁর heart (হৃদয়বত্তা), সর্বজীবে ভালবাসা, ভগবানের জন্য টান, আর তাঁর ত্যাগটা জীবনের আদর্শ করবে।

প্রশ্ন -- ঠিক বলেছেন, মহাশয়। আমি আপনার ভাব প্রথমে বুঝতে পারিনি। (কড়জোড়ে) মাপ করবেন। তাই আপনাকে বৈষ্ণবদের মধুরভাব নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করতে দেখে কেমন বোধ হয়েছিল।

স্বামীজী -- (হাসিতে হাসিতে) দেখ, গালাগাল যদি দিতেই হয় তো ভগবানকে দেওয়াই ভাল। তুমি যদি আমাকে গাল দাও, আমি তেড়ে যাব। আমি তোমাকে গাল দিলে তুমিও তার শোধ তোলবার চেষ্টা করবে। ভগবান তো সে-সব পারবেন না।

এইবার প্রশ্নকর্তা তাঁহার পদধূলি লইয়া চলিয়া গেলেন। স্বামীজী দর্শনার্থীদের ফিরাইয়া দিতে চাহিতেন না। তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে কাহারও কথা তিনি রাখিতেন না। বলিতেন, 'তারা এত কষ্ট করে দূর থেকে হেঁটে আসতে পারে, আর আমি এখানে বসে বসে একটু নিজের শরীর খারাপ হবে বলে তাদের সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারি না?'

ঐদিন বেলা তিন-চারিটা হইবে। স্বামীজীর সহিত উপস্থিত পয়েকজনের অন্য কথাবার্তা হইতে লাগিল। ইংলন্ড ও আমেরিকার কথাও হইতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে স্বামীজী বলিলেন: ইংলন্ড থেকে আসবার সময় পথে বড় এক মজার স্বপ্ন দেখেছিলুম। ভূমধ্যসাগরে আসতে আসতে জাহাজে ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্নে দেখি -- বুড়ো থুড়থুড়ো ঋষিভাবাপন্না একজন লোক আমাকে বলছে, 'তোমরা এস, আমাদের পুনরুদ্ধার কর, আমারা হচ্ছি সেই পুরাতন থেরাপুত্ত সম্প্রদায় -- ভারতের ঋষিদের ভাব নিয়েই যা গঠিত হয়েছে। খ্রীষ্টানেরা আমাদের প্রচারিত ভাব ও সত্যসমূহই যীশুর দ্বারা প্রচারিত বলে প্রকাশ করেছে। নতুবা যীশু নামে বাস্তবিক কোন ব্যক্তি ছিল না। ঐ-বিষয়ক নানা প্রমাণাদি এই স্থান খনন করলে পাওয়া যাবে।' আমি বললাম, 'কোথায় খনন করলে ঐ-সকল প্রমাণ-চিহ্নাদি পাওয়া যেতে পারে?' বৃদ্ধ বলিল, 'এই দেখ না এখানে।' এ-কথা বলে টার্কির নিকটবর্তী একটি স্থান দেখিয়ে দি। তারপর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙবামাত্র তাড়াতাড়ি উপরে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন জাহাজ কোন্ জায়গায় উপস্থিত হয়েছে?' ক্যাপ্টেন বলল, 'ঐ সামনে টার্কি এবং ক্রীটদ্বীপ দেখা যাচ্ছে।'